আমার গুরু শাঁটুলদা

জহর সরকার

দ্বন্দ্বহীন হয়ে বলতে পারি, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা 'শাঁটুলদা'-ই আমার এক ও অদ্বিতীয় 'গুরু'। স্বীকার করতে সামান্য দ্বিধাও নেই যে, শাঁটুলদার সঙ্গে দেখা না হলে আমার মনোজগৎ ও বহির্বিশ্ব-চেতনা এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠত না। যে বিপুল খ্যাতি এবং মহাস্তরীক ব্যুৎপত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন তা সীমাবদ্ধ থাকেনি কোনও একটি বা দু'টি বিষয়ে। অবলীলাক্রমে জ্ঞানচর্চার বহু শাখায় তিনি বিচরণ করেছিলেন। 'বহুমুখী প্রতিভাধর' বলতে যা বোঝায়, আমার চোখে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ঠিক তা-ই। পাশাপাশি তিনি একজন অনবদ্য কথক।

বাড়ির বৈঠকখানায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

গুরু ধরা, নাড়া বাঁধা, দীক্ষা নেওয়া— এসব থেকে আমি বরাবরই দূরত্ব রেখে চলেছি। কাজেই আমাকে যাঁরা নিবিড়ভাবে চেনেন, তাঁরা এই লেখাটির এহেন শিরোনাম দেখে নিঃসন্দেহে চমকে যাবেন। কিন্তু উপায়ই বা কী! কারণ, এখানে 'গুরু' শব্দটির মধ্যে বোপিত হয়ে আছে গভীর কৃতজ্ঞতার বোধ। সবচেয়ে মজার কথাটি হল, যাঁর উদ্দেশে এই 'গুরু'ত্ব আরোপ করলাম, সে-ই মানুষটি যদি ঘটনাচক্রে এসব শুনতেন, হো হো করে কাঁপিয়ে হেসে উঠতেন। গত সাত দশকে আমি নেহাত কম জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসিনি। তবু দ্বন্দ্বহীন হয়ে বলতে পারি, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা 'শাঁটুলদা'-ই আমার এক ও অদ্বিতীয় 'গুরু'। স্বীকার করতে সামান্য দ্বিধাও নেই যে, শাঁটুলদার সঙ্গে দেখা না হলে আমার মনোজগৎ ও বহির্বিশ্ব-চেতনা এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠত না।

মানুষটি ছিলেন এককথায় 'অ্যামেজিং'। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। শাঁটুলদার কাছে আমাকে প্রথম নিয়ে যান বিভাস গুপ্ত। কী বলব, তিনিও এক আশ্চর্য গুণময় মানুষ। আমি ডাকতাম 'বিভাসবাবু' বলে। তিনি ছিলেন একাধিক বিষয়ে কৃতবিদ্য। ডাকটিকিট জমাতেন ও সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, প্রাচীন শিল্পবস্তুর বিদগ্ধ সমঝদার, বই প্রকাশনার খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে, ফটো কপি করার বিজ্ঞান বিষয়ে সম্যক অবহিত, এবং এসবের পাশাপাশি পুরনো কলকাতার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর ছিল তীব্র আকর্ষণ। লালবাজারের এক কর্তা এই বিভাসবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় আমি কী করছি তাও বলা দরকার বইকি। তখন ব্যারাকপুর মহকুমার দায়িত্বে আছি। ব্যারাকপুর তখনও কলকাতার ঘাড়ে শ্বাস ফেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অঙ্গ। পরে, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গে মিশে গেলে কর্মসূত্রে, আমারও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ নিবিড় হল। মাঝে মাঝেই আসতে হত মহানগর কলকাতায়।

তেমনই এক কলকাতা-সফরে এসে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রাধাপ্রসাদ গুপ্তর অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার। শাঁটুলদা থাকতেন গড়িয়াহাটের অতি-কুলীন চত্বর ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের একটি বহুতলে। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে রাধাপ্রসাদ গুপ্তর দরজায় উপনীত হতেই অবাক হওয়ার পালা। সাদা-কালো মুদ্রণে আলোকিত হয়ে দুই নৃত্যরত সুন্দরী সদর দোরের সামনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে! এই হলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, এই হল তাঁর স্বকীয়তার নমুনা। এই অ্যাপার্টমেন্টের অন্য ফ্ল্যাটগুলিও তো ধরনে-ধারণে, দেখতে-শুনতে এক ধারার। ফলে তাদের সঙ্গে তফাত তৈরি করতে, বা বলা ভাল, আত্মপরিচয়ে উদ্ভাসিত হতে চেয়েই এমন উনিশ শতকীয় উডকাট ব্লক প্রিন্ট দরজায় সজ্জিত করেছিলেন সযত্নে। একবার যিনি দেখবেন এই শিল্পবিভা, তিনি কখনও এর সৌন্দর্য ভুলতে পারবেন না। আর, তাঁর কাছে চিরকাল রাধাপ্রসাদ গুপ্তর প্রবেশদ্বারটির স্মৃতিও রয়ে যাবে অক্ষুণ্ণ। বাস্তবে হয়েওছিল নাকি তাই। কাগজঅলা, দুধঅলা, চিঠিচাপাটি দিতে আসা শিল্প-বিযুক্ত লোকজনও নির্ভুলভাবে জানতেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কে? এক ভদ্রলোক, ঈষৎ বয়স্ক, এবং যাঁর দোরে একজোড়া নৃত্যরত সুন্দরী অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাতে সদাপ্রস্তুত।

ইয়ান জ্যাকের চুম্বকে দেওয়া বিবরণ অব্যর্থভাবে চিনিয়ে দেয় শাঁটুলদাকে। যে বিপুল খ্যাতি এবং মহাস্তরীক ব্যুৎপত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন তা সীমাবদ্ধ থাকেনি কোনও একটি বা দু'টি বিষয়ে। তিনি অনির্বাণ গ্রন্থপ্রেমী, পড়েননি হেন ক্লাসিক নেই। ইংরেজি ও বাংলা দু'টি ভাষায় পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারেন নির্ভার ভঙ্গিতে। তিনি পাকপণ্ডিত। খাদ্যসংস্কৃতির পাকস্থলীটিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চেনেন। তিনি চলচ্চিত্রের সবিশেষ অনুরাগী। তিনি সূক্ষ্ম এবং সুরম্য রুচির অধিকারী, নানা রঙের বিচিত্র গল্পরেণু বহু আয়াসে সংগ্রহ করেছেন। আর, এসবের সঙ্গেই বলতে হয়, তিনি একজন অনবদ্য কথক। তাঁর কথায়, বাচনে ধরা পড়ে অবিকল্প উচ্চতা। শব্দের মহিমা ব্যবহার করে তিনি হৃদয় জিতে নিতে পারেন।

আমার সঙ্গে যখন শাঁটুলদার আলাপ হচ্ছে, তখন তিনি হয় টাটা-র জনপ্রতিনিধি আধিকারিকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চলেছেন, বা সদ্য শেষ করেছেন বিস্তৃত কর্মজীবন। চাকরির জগতে নেহাত কম সুনাম অর্জন করেননি। তা সত্ত্বেও যেটা বলব, শাঁটুলদা 'শাঁটুলদা' হয়ে উঠেছিলেন অপরিমেয় জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে। 'এপিকিউরিয়ান' বলে একটি লাতিন শব্দ আছে। আক্ষরিক বাংলায় অর্থ দাঁড়ায়, 'সুখান্বেষী'। পরিশীলিত ইন্দ্রিয়সম্ভোগযোগ্য সুখের সন্ধানে যিনি অনুৎসাহী নন। রাধাপ্রসাদ গুপ্তর বেলায় এই কথাটা খাটে ষোলো আনা, যা তাঁকে তর্কাতীতভাবে 'শাঁটুলদা' করে তুলেছিল। বই ও কালীঘাটের পটচিত্র বিষয়ে তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রটি কতদূর ছড়ানো ছিল, তা নিয়ে নতুন করে কী বলি! 'শাঁটুলদা' বললেই মানুষের মনশ্চক্ষে তা স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়।

এবং কিছুতেই ভুললে চলবে না, শাঁটুলদা কিন্তু 'শাঁটুলদা' হয়েছিলেন 'গুগ্‌ল'-পূর্ব যুগে। ইন্টারনেটবাহিত জ্ঞানবাহারের দরকার তাঁর হয়নি। অবলীলাক্রমে জ্ঞানচর্চার বহু শাখায় তিনি বিচরণ করেছিলেন। 'বহুমুখী প্রতিভাধর' বলতে যা বোঝায়, আমার চোখে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ঠিক তা-ই। তাঁর কাছে কোনও কিছু জানতে এসে সদুত্তর না পেয়ে কেউ ভগ্ন

মন নিয়ে ফিরে গিয়েছেন বলে তো জানি না, কখনও শুনিওইনি। বরং, যা জানার ছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি ফসল নিয়ে প্রত্যেকে ফেরত যেতেন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্তর গৃহে পা রেখে আমি প্রথম দিন কী কী দেখেছিলাম? হাফহাতা সাদা ফতুয়া ও পাজামা পরে মানুষটি বসে আছেন আরামকেদারায়। পাশে রাখা গুচ্ছ বই। পরে আবিষ্কার করেছিলাম, দুঁদে জনসংযোগ আধিকারিকের এটাই ছিল নিত্যদিবসীয় পোশাক— ফতুয়া ও পাজামা। ঘরের ওই কোণে বসেই তিনি সচরাচর সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতেন— বই, পটচিত্র, ছাপাই ছবি, উডকাড, ম্যাপ, অলংকরণে পরিবেষ্টিত হয়ে। দেয়াললগ্ন বুকসেল্ফে থরে থরে বই সাজানো। কিছু থাকত আরও নাগালে, তুলনায় ছোট চতুষ্কৌণিক একটি আধারে। তার যে-দু'টি দিক খোলা, তার একটা দিক ধরে এগলে পৌঁছনো যাবে ছোট্ট কিন্তু অপরিসর নয় এমনই এক পুবমুখী দিলখোলা ব্যালকনিতে। সেখান থেকে তিলোত্তমা কলকাতার অসম্ভব ভাল তথা শ্বাসহরণকারী দৃশ্য পাওয়া যেত। অন্যদিক ধরে এগলে, চলে যাওয়া যেত, অন্দরমহলে। ডাইনিং ও লিভিং স্পেসে।

শাঁটুলদা সেদিন নির্ঘাত অবাক হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কীসের টানে এবং কেন আমার মতো একজন গুটি থেকে তখনও রেশমে রূপান্তরিত হয়নি এমন অ-পরিশোধিত বা 'র' চরিত্রের আমলা তাঁর কাছে হাজির হয়েছে! আমার সঙ্গে খানকয়েক সৌজন্যসূচক কথা চালাচালির পরেই তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন বিভাসবাবুর সঙ্গে নিগূঢ় আলোচনায়। পাশে বসে সেসব শুনতে শুনতে মনে হল, আমার সামনে এমন এক অভাবিত ঘুমের দরজা খুলে যাচ্ছে যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতদিন আমি জানতামই না! শাঁটুলদা এবং বিভাসবাবু দু'জনেই প্রায় পুরো জীবন বই-সঙ্গে কাটিয়েছেন। ফলে বই ও দুর্মূল্য সংস্করণের জগতে তাঁরা অচিরে ডুবে গেলেন। যে চিত্তচাঞ্চল্য তাঁদের কথায় দেখতে পেলাম, যে সজীব প্রাণোচ্ছ্বাস আমাকে দোলা দিয়ে গেল, তা থেকে মনে হতে লাগল, এমন গহন প্রীতির সম্পর্কটি বুঝি-বা তুলনীয় হতে পারে রেসের মাঠের বুকি ও জুয়াড়ির জীবন-দাঁও-রাখা কথাবার্তার সঙ্গেই। অ্যাইসা-অ্যাইসা বইয়ের নাম ও পরিচয় উঠে আসতে লাগল তাঁদের আলোচনায়, যেগুলি একেবারেরই সুলভ নয় সংগ্রহ করার পক্ষে। আর, সেসব বইয়ের একটি বা দু'টি কপি হয়তো সম্প্রতি নির্দিষ্ট করা গিয়েছে। সেদিন আমার পক্ষে অনুমান করা দুঃসাধ্য ছিল যে, এই আলোচনার খেই ধরে ধীরে ধীরে আমার ভেতরে বইয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ তৈরি হয়ে যাবে একদিন। আরও একটা এই প্রসঙ্গে না বললে নয়। কেবল অগাধ জ্ঞান নয়, সেদিন আমার মনে অবিনশ্বর ছাপ রেখে গিয়েছিল মানুষটির কথা বলার আন্তরিকতাও। ভীষণ ঘরোয়াভাবে তিনি নানা সরস বিষয়ে কথা বলে যেতে পারতেন। সেই অবিশ্রান্ত কথনে ঝরে পড়ত উত্তর কলকাত্তাইয়া বাকবিভূতির অনন্য সৌরভ।

ক্রমে আমি টের পেলাম— শাঁটুলদা বিশুদ্ধ, তৎসমবহুল, সংস্কৃতমথিত বাংলা ভাষাতেও অনর্গল বলতে পারেন, সমান দক্ষতায় বলতে পারেন ওড়িয়া, এহ বাহ্য, ইংরেজি ভাষার বিবিধ প্রকারন্তরের সঙ্গেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। অনেকেই জানেন না, আমিও গোড়ায় জানতাম না যে, রাধাপ্রসাদ গুপ্তর জন্ম আসলে কটকে। ওঁর ঠাকুরদা ওড়িশার স্বনামধন্য র‍্যাভেনশ কলেজের প্রথম স্বদেশি অধ্যক্ষ। স্নাতক হওয়ার পরে শাঁটুলদা কলকাতায় আসেন। অসময়ে বাবাকে হারান।

সৈন্যসামন্ত ও সাঁজোয়া গাড়ির গিজগিজানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-লগ্ন কলকাতা অন্যতর আকর্ষণ ছিল। মার্কিনরা যে ইংরেজি সংস্কৃতির আমদানি করেছিল তার মধ্যে অদ্ভুতত্বও কম ছিল না। কেননা তা ছিল উদ্ধত ও একগুঁয়ে ব্রিটিশ শাসকদের আরোপ করা ইংরেজি সংস্কৃতি থেকে অনেকখানি পৃথক। তাছাড়া, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মার্কিনরা মিশতেও পারত তুলনায় ঢের সহজভাবে। সিগারেট, চকোলেট, ক্যানে ভরা খাবারদাবার, কমিকস-সহ আরও অনেক জিনিস আমেরিকানরা আমদানি করে। এই শহরের মানুষদের সঙ্গে সেসব তারা ভাগ করে নিতে পেরেছিল নিঃস্বার্থভাবে, অকুণ্ঠ চিত্তে। আমেরিকানরা সিনেমাপাগল ছিল। সেই সুবাদে হলিউডি ফিল্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়ে কলকাতায়। এই সামাজিক প্রতিবেশ তাড়িত করে শাঁটুলদাকে নিষ্ঠ পর্যবেক্ষক হয়ে উঠতে। তিনি এই পারিবেশিক তন্ত্রীগুলির নড়েচড়ে ওঠার মন্থন আস্বাদন করতে উদগ্রীব হন। সামান্য টিউশন ও এটা-সেটা কাজ করে জীবন নির্বাহ করেছিলেন। অথচ যে-জ্ঞান তিনি শুষে নিয়েছিলেন, তা পরিমাণে যেমন বিস্ময়কর, তেমনই তার নেপথ্যে ধরাবাঁধা কোনও কারণ ছিল না, নিখাদ আনন্দ ছাড়া। তৎকালের অন্যান্য শাখার সেরা সৃজনশীল মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মত-বিনিময়ের সুযোগ ঘটেছিল। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, এই সময়ই তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, মুল্ক রাজ আনন্দ, রঘুবীর সিং— এঁদের আলাপ ঘটে। সিনেমার প্রতি ভাল লাগা থেকেই ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত-সহ আরও কিছু চলচ্চিত্রপ্রেমীর সঙ্গে একজোট হয়ে তিনিও যুক্ত হন 'কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি'-র গড়ে ওঠায়। পরে, শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ শুরু হলেও সিনেমা-প্রেমে যে ঘাটতি পড়েনি, তা বোঝা যেত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আলোচনায় ঢুকলে। নাগাড়ে বলে যেতেন 'বায়োস্কোপ' বিষয়ে। হ্যাঁ, এই শব্দটিই ছিল তাঁর কাছে সিনেমা-দ্যোতক।

বাঙালির আড্ডা আদতে যেমন হয়, ঠিক সেই ঐতিহ্যবাহী বৈঠকি কায়দায় এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ভেসে যেতেন শাঁটুলদা। তবে আমি বিক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে ফেলার ধরন তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম, কারণ তাতে শেখার পরিসরটা বাড়ত। আলিপুরে আমার জেলা সদর দফতরে বৈঠক সেরে ব্যারাকপুর ফেরার পথে দু'-তিন মাইলের মধ্যেই অবস্থিত শাঁটুলদার বাড়িতে হানা দিতাম আমি। এই পথ ভুলে ওঁর বাড়ি চলে যাওয়াটা আমাকে নতুন প্রাণশক্তি দিত। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া নিয়ে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম বটে, কিন্তু রাধাপ্রসাদ গুপ্তই আমাকে প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন ফুটপাথে ছড়িয়ে থাকা পুরনো বইয়ের মণিমাণিক্যের। ফলে, আমার নিজস্ব বইয়ের সংগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন সদ্য বিবাহ হয়েছে আমার, আমার স্ত্রী আমার এজাতীয় অভ্যাসের বিষয়ে নেহাতই সহিষ্ণু ছিলেন। তখন আমার বেতন ছিল খুদকুঁড়োর শামিল। ওদিকে নতুন নতুন বইয়ের তাক হচ্ছে, আর চোখের পলকে তা ভরে যাচ্ছে।

দেড় বছরের মধ্যে আমি আসানসোলে চলে গেলাম। আরপি এবং কলকাতার বইবাজারের সঙ্গে আমার সংশ্রব কমে গেল। কিন্তু ১৯৮২ সালে যখন আমি বারাসতে বদলি হলাম, তখন আবার সময় পেলেই দেখা করতে যেতাম শাঁটুলদার সঙ্গে। কখনও কখনও যাওয়ার পথে একটা 'ওল্ড মঙ্ক'-এর রামের বোতল তুলে নিয়ে যেতাম। শাঁটুলদার স্ত্রী মণিদি ছিলেন রীতিমতো অতিথিবৎসল। প্রায়শই আমাকে তিনি রাতে খেয়ে যেতে বলতেন।

শাঁটুলদা ততদিনে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ওঁর ছাতার তলায় আশ্রয় দিয়েছেন এবং আঠারো ও উনিশ শতকের কলকাতার বিষয়ে বহু বইপত্র দিয়েছিলেন। বিভাসবাবু এক্ষেত্রে খুব সাহায্য করেছিলেন, সম্পূর্ণ আউট অফ প্রিন্ট বইপত্র তিনি জোগাড় করে দিতেন। এই সময়েই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পি. থাঙ্কাপ্পন নায়ারের, যিনি 'খালি পায়ে ঘুরে' কলকাতার ইতিহাস নথিভুক্ত করেছিলেন। পি. টি.

নায়ার ছিলেন জ্ঞানের খনি। বস্তুত, শিগগিরই আমি ছোটখাটো তথ্য শাঁটুলদাকে দিতে শুরু করলাম। আমার এহেন অগ্রগতি দেখে শাঁটুলদা যেমন বিস্মিত হলেন, তেমন খুশিও হলেন।

কালীঘাটের সাবেক লোকশিল্প, যাকে আমরা 'কালীঘাটের পট' নামে জানি, সেই বিষয়ে আমার জ্ঞানের সিংহভাগটাই শাঁটুলদার দাক্ষিণ্যে অর্জিত। পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে পটচিত্র বিষয়টাকে পরিচিত করেছিলেন উইলিয়াম এবং মিলড্রেড আর্চার। সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে তাঁদের কিছু বই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। পটের সূত্রে অন্যান্য লোককৃতি এবং নানা সৃষ্টিশীল ধারা বিষয়ে আমার আগ্রহ বাড়তে লাগল।

অল্প সময়ের মধ্যে আমি শহরে বদলি হয়ে এলাম। আমলাতন্ত্রের জটিলতা আমাকে পেয়ে বসতে শুরু করল। নিজের ছন্দে কোনও কিছু করার স্বাধীনতা এবার আমার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে শুরু করল। আমার ঊর্ধ্বতনরা সম্পূর্ণ এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য চাইছিলেন। সঙ্গে চেপে বসছিল হাজারও বিধিনিষেধ। এটাই হয়তো আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, কিন্তু একজন কর্মচারীর মানসিক স্বাস্থ্যে তা প্রায়ই প্রভাব ফেলে। মন্ত্রী ও আমার দফতরের সচিবের সঙ্গে আমার মতানৈক্য চরমে পৌঁছল। সেই সময় সরকার আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজ্যের হস্তশিল্প উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে পাঠাল, একজন আইএএস অফিসারের পক্ষে যা হয়তো তেমন সম্মানের নয়। আমার সহকর্মীরাও আমার এই 'অধঃপতন'-এর জন্য আমাকে সমবেদনা জানালেন। কিন্তু যাঁরা আমাকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তাঁরা বুঝলেন না, আমি এতে আসলে খুশিই হলাম। খুশি হয়েছিলেন শাঁটুলদাও। এবার লোকশিল্প বিষয়ে আমার নবজাগ্রত আগ্রহ এবং প্যাশনকে আরও জলহাওয়া দিতে পারব আমি, আর তার জন্য বেতনও পাব। এমন ভয়াবহভাবে উপেক্ষিত একটি শাখার যা যা সমস্যা থাকতে পারে, এক্ষেত্রেও তাই ছিল। তবে আরপি-র মতো শিল্পরসিক মানুষের প্রশ্রয়ে আমি আশার আলো দেখতে পেলাম যেন।

আমার অফিসে প্রায়ই ঢুঁ মারতেন শাঁটুলদা। আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার অফিসে পা রাখলেন মুল্‌ক রাজ আনন্দ। তাঁর সঙ্গে শাঁটুলদার বাড়িতে এর আগে দু'বার আমার দেখা হয়েছিল, আমার মনে পড়ে, একবার তাঁর বেলুন গ্লাস ভর্তি ব্র্যান্ডিতে ফুটন্ত গরম জল ঢালতে সাহায্য করেছিলাম আমি। সেদিন অফিসে উনিশ শতকের কলকাতার উডকাট পেন্টিং নিয়ে একটি বই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন শাঁটুলদা। এমনিতেই বইটার ওপর আমার বেশ লোভ ছিল, খুব দামি বলে কেনার ব্যাপারে দ্বিধা করছিলাম। বইটা পেয়ে আপ্লুত হয়ে আমি মুল্‌ক রাজ আনন্দকে আর্জি করলাম প্রথম পাতায় কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। যে মন ছুঁয়ে দেওয়া লাইনগুলো তিনি লিখে দিয়েছিলেন, তা বইয়ের পাতার পাশাপাশি আমার মনের ভেতরেও সযত্নে লেখা হয়ে রয়েছে— লোকশিল্পী সম্প্রদায়কে তাঁদের শিল্পকলা ফিরিয়ে দাও, আর তাঁদের দক্ষতার ফলস্বরূপ যা পাবে, তা গ্রহণ করে নাও।

আমার এই অধ্যায়ের সবচেয়ে ভাল স্মৃতি হল বিষ্ণুপুর এবং লোকশিল্পের ঐতিহ্যবাহী বাঁকুড়ার অন্যান্য গ্রামগুলোতে দীর্ঘ যাত্রা। সেই যাত্রায় আমার সঙ্গী হয়েছিলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত এবং অমল ঘোষ। তাঁদের থেকে যে কত কিছু শিখেছিলাম! পাঁচমুড়া গ্রামে মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে বসেছিলাম আমরা, তাঁদের সৃষ্ট অসম্ভব সুন্দর দীর্ঘ গ্রীবার 'বাঁকুড়ার ঘোড়া' বিক্রি করা নিয়ে কী সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছিল। বালুচরি শাড়ি তৈরি করেন যে তাঁতশিল্পীরা, শতাব্দীপ্রাচীন দশাবতার তাস বানান, এমন হাতে গোনা যে শিল্পীরা টিকে ছিলেন— তাঁদের সঙ্গে কথা বলার বা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। আর এই গোটা যাত্রাপথে প্রাচীন শিল্পের বিষয়ে শাঁটুলদার জ্ঞান দেখে সমৃদ্ধ হয়েছিলাম আমি। শাঁটুলদা খুব উপভোগ করেছিলেন সেবার। আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন নোট নেওয়ার জন্য। অমলদা ছবি তুলেছিলেন।

সেসময় আমার আত্মবিশ্বাস বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে এবং আমি খবরের কাগজে লেখালিখি শুরু করেছি। মূলত প্রাচীন কলকাতা এবং তার সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিষয়ে। ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘ সাত বছর আমি কলকাতা এবং শাঁটুলদার থেকে দূরে ছিলাম। আমি প্রথমে হয়েছিলাম বর্ধমানের জেলাশাসক। বর্ধমানে শাঁটুলদা একবার এসেছিলেন। তারপর দিল্লিতে বাণিজ্য মন্ত্রকের কাজে চলে যাওয়া। তবে ততদিনে আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন শাঁটুলদা, জীবন সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি তখন। দিল্লিতে মুল্‌ক রাজ আনন্দের সঙ্গ পেয়েছি আমি। আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণও করতেন তিনি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা দিক নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আড্ডা হত সেসময়।

আরপি-র অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গও ছিল একইরকম উপভোগ্য। যেমন, বসন্ত চৌধুরী। বিখ্যাত এই অভিনেতা একজন উচ্চমার্গীয় শিল্প-সমঝদার ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন মুদ্রা, বিভিন্ন ধাতুনির্মিত গণেশ মূর্তি, উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের শাল— কত কিছুর যে সংগ্রহ ছিল তাঁর! এছাড়াও আরপি-র আরেক উল্লেখযোগ্য বন্ধু ছিলেন নিখিল সরকার, যাঁকে আমরা 'শ্রীপান্থ' নামে চিনি। প্রান্তিক কলকাতা ও তাঁর সংস্কৃতি নিয়ে ওঁর পাণ্ডিত্য ছিল সুবিদিত। আমার সঙ্গে শিল্পী ও রসজ্ঞ সুভো ঠাকুরের আলাপ আরপি-ই করিয়ে দিয়েছিলেন। চৌরঙ্গী এবং এস. এন. ব্যানার্জি রোডের মোড়ে সুভো ঠাকুরের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ব্রিটিশ আমলের। নানাবিধ চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পাইপের আশ্চর্য সংগ্রহ, হুকা, তামাক-সংক্রান্ত নানা দ্রব্য ছিল সেই বাড়িতে। আরপি-র সঙ্গে বহুবার গিয়েছি সেখানে, কখনও কখনও বসন্ত চৌধুরীও আসতেন সেখানে। ইশ, যদি এই তিন মহান ব্যক্তিত্বর একটা ছবি তুলে রাখতাম একসঙ্গে!

শাঁটুলদার আগ্রহ কীভাবে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তার তালিকা করতে থাকলে শেষ হবে না। সব 'গুরু' কিন্তু তাঁর শিষ্যদের এই সম্পদ দিয়ে যেতে পারেন না। শাঁটুলদার জ্ঞানের পরিধির বিস্তার নিত্যনতুন বিষয়ে জানতে আমাকে উৎসাহিত করেছে বরাবর। আর এই জ্ঞানান্বেষণের কেন্দ্রে থেকেছেন আরপি এবং জ্ঞানের প্রতি তাঁর অসীম পিপাসা। কখনও তাঁর উপচে পড়া জ্ঞানের অহংয়ে কাউকে তুচ্ছ করেননি তিনি, বরং জানার আনন্দ, আর জীবনের সবটুকু শুষে বেঁচে নেওয়া শিখিয়েছেন তিনি সকলকে। শেক্সপিয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ, তাঞ্জোর পেন্টিং থেকে ওয়াইনের ভালমন্দ, সোনাগাছির আশ্চর্য সব কাহিনি থেকে শুরু করে চোরবাগান পেন্টিং— সব বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল ওঁর। একটা সময়ের পর যত পদমর্যাদা বাড়তে লাগল আমার, তত আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। কখনও ঘটনাচক্রে ওঁর এলাকায় গিয়ে পড়লে দেখা করে আসতাম। ১৯৯৯ সালে ডোভার টেরেসে একটা ছোট্ট নিজের বাড়ি হল আমার। তখন ওঁকে বলেছিলাম, সুযোগ পেলেই ওঁর ফ্ল্যাটে চলে যাব যখনতখন। কিন্তু কথা রাখার সুযোগটাও দিলেন না শাঁটুলদা। চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। ওঁকে শেষবার আমার দেখাও হল না, তখন আমি দিল্লিতে, কোনও জাতীয় স্তরের কনফারেন্সে। মনটা খারাপ হয়ে যায় ভাবলেই। তবে, আমার আশপাশে যেন তিনি সবসময়ই রয়েছেন। আমাকে আরও জানতে উৎসাহিত করছেন, আমাকে কান খাড়া করে রাখতে বলছেন ফিরিওয়ালার ডাক শোনার জন্য।

(প্রবন্ধটি অনূদিত এবং সংক্ষেপিত)